বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ : গুরু-শিষ্য সমাচার

চন্দনা রাণী বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ঊনবিংশ শতাব্দীর অশেষ কীর্তিমান এক বাঙালি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নির্মাতা তিনি। কেবল সাহিত্যই নয়, তাঁর স্বদেশভাবনা, জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবোধ প্রভৃতি কারণে তিনি বাঙালির চিরস্মরণীয়। বাংলার আর এক কৃতী সন্তান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। তাঁর বংশীয় পদবী ভট্টাচার্য। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। এর পর থেকে তাঁর নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয় 'শাস্ত্রী' । হরপ্রসাদ ছিলেন প্রথিতযশা সংস্কৃত-পণ্ডিত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি চর্চার পথিকৃৎ এবং বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ। বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ– এই দুই মনীষীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যের। হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছেন খুব আপন পরিবেশে, পারিবারিক পরিমণ্ডলে, সাহিত্যসভায়, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডারত ইত্যাদি নানা অবস্থায়। হরপ্রসাদ বঙ্কিমের স্নেহধন্য ছিলেন এবং তিনি তাঁকে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন। এ কথা তিনি তাঁর লেখা ও কথায় স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমমচন্দ্র সম্পর্কে হরপ্রসাদের চারটি স্মৃতিকথা প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায়। হরপ্রসাদের এ স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ ও প্রেরণা, তাঁদের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের নানা দিক এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। লেখক জীবনের প্রথম দিকে বঙ্কিমপ্রভাব যুক্ত হরপ্রসাদ পরবর্তীকালে বঙ্কিমপ্রভাব মুক্ত হয়েছেন। হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর গুরু এবং অভিভাবক মনে করলেও সাহিত্যভাবনাতে তিনি গুরুপ্রদর্শিত পথে হাঁটেননি। এমন কি এ নিয়ে গুরুর সাথে মতবিরোধ হলেও শিষ্য তাঁর নিজের সাহিত্যভাবনার স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানত হরপ্রসাদের বঙ্কিম-স্মৃতিকথাকে ভিত্তি করে গুরু-শিষ্য সম্পর্কিত নানা দিক উপস্থাপন করার প্রয়াস করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন কলকাতার অদূরে নৈহাটির কাঁটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চার পুত্রের মধ্যে বঙ্কিম ছিলেন তৃতীয়। বঙ্কিমের দুই অগ্রজ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র, কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বনামে খ্যাত সাহিত্যিক। বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় (১৮৫৪) সাতটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয়েই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা (১৮৫৬) দিয়ে তিনি মাসিক বিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য, এ বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি.এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। মোট ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দু'জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এ দু'জন হলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। একই পদে থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। চাকরিজীবনে তাঁর বিশেষ পদোন্নতি হয়নি। একই সঙ্গে কর্মরত পদোন্নতিপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের তুলনায় বেশি যোগ্যতা অথবা সমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে যথেষ্ট পদমর্যাদা দেওয়া হয়নি। স্বাধীনচেতা বঙ্কিমচন্দ্র এই অবমাননা মানতে পারেননি। তাঁর স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণের এটা একটা প্রধান কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসামান্য সাহিত্যকৃতির জন্য চিরস্মরণীয়। তিনি 'সাহিত্যসম্রাট' এবং আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক হিসেবে স্বীকৃত। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থেকেও তিনি তাঁর স্বল্পপরিসর (৫৬ বছর) জীবৎকালে চৌদ্দটি উপন্যাস এবং অসংখ্য মননশীল প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। বিশেষভাবে আলোচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪) স্মর্তব্য। *আনন্দমঠে* উল্লিখিত *'বন্দে মাতরম্'* গানটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে খুবই প্রাণ সঞ্চার করেছিল। স্বদেশীদের কাছে *'বন্দে মাতরম্'* ছিল অগ্নিমন্ত্রের মতো। *বন্দে মাতরম্* উচ্চারণ করে বহু প্রাণ বিসর্জিত হয়েছে। এই গানটি রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঋষি বঙ্কিম' অভিধায় অভিহিত হয়েছেন। উপন্যাস ব্যতিরেকে তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে *লোকরহস্য (১৮৭৪)*, *বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫), *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫), সাম্য (১৮৭৯), *মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত* (১৮৮৪), *কৃষ্ণচরিত্র* (প্রথম

ভাগ,১৮৮৬), *কৃষ্ণচরিত্র* (পূর্ণাঙ্গ, ১৮৯২), *বিবিধ প্রবন্ধ* (প্রথম ভাগ, ১৮৮৭), *বিবিধ প্রবন্ধ* (দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২), *ধর্মতত্ত্ব* (প্রথম ভাগ, অনুশীলন, ১৮৮৮), *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* (১৯০২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য চর্চায় প্রসিদ্ধ ছিল তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। মাত্র আট বছর বয়সে হরপ্রসাদের পিতৃবিয়োগ ঘটে। এ সময় তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু তাঁকে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে অবস্থিত 'অ্যাঙ্গলো বেঙ্গল' স্কুলে ভর্তি করান। তখন হরপ্রসাদের নাম ছিল 'শরৎনাথ ভট্টাচার্য'। বলা হয়, কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে হর বা শিবের প্রসাদে তাঁর রোগমুক্তি হয়। এরপর তাঁর নাম হয় 'হরপ্রসাদ'। ১৮৬২ সালে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে নন্দকুমারের অকালমৃত্যু হলে তাঁদের পরিবার চরম দুর্গতিতে পড়ে। এ কারণে হরপ্রসাদকে নৈহাটিতে ফিরে আসতে হয়। এ সময় কিছুদিন হরপ্রসাদ কাঁটালপাড়ার একটি টোলে পড়ালেখা করেছিলেন। এরপর বিদ্যাসাগর কিছুদিন বালক হরপ্রসাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হরপ্রসাদকে কলকাতায় নিজের বাড়ির ছাত্রাবাসে নিয়ে আসেন। হরপ্রসাদ তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ সময় বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন ১৩/১৪ বছরের কিশোর হরপ্রসাদ আশ্রয় নিয়েছিলেন বৌবাজারের গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে তাঁকে ছাত্র পড়িয়ে নিজে রান্না করে খেতে হতো। তাঁর ছাত্রজীবন ছিল দারিদ্রদশাযুক্ত। কিন্তু পরীক্ষার ফল ছিল অনন্য সাফল্যময়। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য কয়েকবার বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উচ্চমানের বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে প্রথম স্থান লাভ করে বি.এ পাস করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ ডিগ্রি ও 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। এখানে তিনি পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেন। ১৮৭৮-৭৯ পর্যন্ত তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। এরপর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সহকারী সরকারি অনুবাদক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি প্রায় তিন বছর নিযুক্ত ছিলেন। এরপর কিছুদিন বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে কাজ করেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন। এরপর তাঁকে Bureau of information for the benefit of civil officers in Bengal in history, religion, customs and folklore of Bengal নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Sanskritic studies and Sanskrit and Bengali বিভাগের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২১ জুন - ১৯২৪ জুন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বৈদগ্ধ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ। ভারতবর্ষীয় জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। সংস্কৃত সাহিত্য, উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য, বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা, ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা, ইতিহাস, বাংলা লিপি, ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ, জীবনী রচনা, স্মৃতিকথা, উপন্যাস রচনা প্রভৃতি তাঁর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কার ও সম্পাদনা তাঁর এক অনন্য কীর্তি। বাঙালি কবি সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত সংস্কৃত *রামচরিত* গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার ও সম্পাদনাও তাঁর একটি প্রধান কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে। উভয়ের বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। ফলে ছোটবেলা থেকেই হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখার সুযোগ পান। একটু বড় হওয়ার পর তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্পর্ক অটুট ছিল। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদের চারটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই লেখাগুলি যথাক্রমে– 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়' (নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ); 'বঙ্কিমচন্দ্র' (নারায়ণ, আষাঢ়, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ); 'বঙ্কিমচন্দ্র' (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ এবং ভাদ্র, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) এবং The Late Bankim Chandra Chatterji (The Calcutta University Magazine, 1 May 1894)। এই চারটি লেখাই 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডে (নভেম্বর ২০০০) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে

দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেখাটি তিনি যথাক্রমে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির বৈঠকখানার দেওয়ালে এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমের মর্মর মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে পাঠ করেন। এ সকল লেখা ও বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের গুরু-শিষ্য সম্পর্কিত নানা সমাচারের সন্ধান পাওয়া যায়।

রথের মেলা দেখা, ধরণী কথক ঠাকুরের কথা শোনার জন্য ছোটবেলায় হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে যাতায়াত করেছেন। তখন ১১ বছর বয়সী হরপ্রসাদ কাঁঠালপাড়ার টোলের ছাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির ফুলবাগান দেখার প্রবল আকর্ষণ ছিল কিশোর হরপ্রসাদের। কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হওয়া তাঁর জন্য দুরূহ ছিল । হরপ্রসাদের ভাষায়– " সে ফুল বাগান দেখিবার আমাদের খুবই শখ ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনোদিন সেদিকে যাই নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হরপ্রসাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয় অনেক পরে। ১৮৭৬ খ্রি. হরপ্রসাদ তখন সদ্য বি.এ পাস করেছেন। এম.এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা শুরু করেছেন। এ সময় *'ভারত মহিলা'* নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে তিনি পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হন। এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস *'দুর্গেশনন্দিনী'* (১৮৬৫ খ্রি.) *'কপালকুণ্ডলা'* (১৮৬৬ খ্রি.), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩ খ্রি.), *'চন্দ্রশেখর'*(১৮৭৫ খ্রি.) এবং *'রজনী'* (১৮৭৭ খ্রি.) প্রকাশিত হয়েছে। তখন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক। মূলত হরপ্রসাদ তাঁর *'ভারতমহিলা'* প্রবন্ধটি প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলেন। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬)। তিনি হরপ্রসাদকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে নিয়ে যান এবং তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি হরপ্রসাদের পরিচয় জানতে পেরে খুশি হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন হরপ্রসাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর অনেক প্রশংসা করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নন্দকুমারের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বঙ্কিমচন্দ্র নাকি খুব কম দেখেছেন। কেন এতদিন হরপ্রসাদ বঙ্কিমের কাছে আসেননি এ প্রশ্নের উত্তরে হরপ্রসাদ বলেছিলেন, সঞ্জীববাবুর ভয়ে। সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন । তিনি তখন হরপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার ভয়ে কেন ? হরপ্রসাদ বলেছিলেন, " শুনিয়াছি কামিনি গাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন ।" তখন সেখানে উপস্থিত সকলের হাসির মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। এমন আলাপচারিতার পর রাজকৃষ্ণবাবু হরপ্রসাদের প্রবন্ধ প্রকাশের প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে:

> ... এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, 'হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।' অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন,'কী কাজ?' রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, 'ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে।' বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "বাংলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা তো নিশ্চয়ই নদনদী পর্বত কন্দর লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম," আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্বত কন্দর' আছে", বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, 'প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।' তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'নন্দের ভাই বাংলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।' আমি তিনটি পরিচ্ছেদমাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ি গেলাম, রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন। ... আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকি অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এগুলি চলিবে কি ?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,' যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোনা।' বলিতে কী, সেদিন আমি ভারি খুশি হইয়া বাড়ি ফিরিলাম। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ১৮-১৯)

হরপ্রসাদের রচনা ও রচনাশৈলী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশংসা অত্যন্ত তাৎপর্যময়। বঙ্কিমের এই মন্তব্য হরপ্রসাদকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত এক দিকপাল বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন মূলত বাইশ-তেইশ বছরের এক ছাত্রকে প্রেরণা দিয়ে তাঁর চলার পথকে বেগবান করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮২ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে চৈত্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে হরপ্রসাদের *'ভারতমহিলা'* প্রকাশিত হয়। এ ঘটনায় আমরা বুঝতে পারি, কতো বড়ো ভালোবাসা ও সম্মান দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নবীন হরপ্রসাদকে 'বঙ্গদর্শনে' এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্যের লেখকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চার বছর প্রকাশিত হয়। এরপর একবছর 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ছিলেন হুগলির ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি তাঁর বাড়ি

থেকেই অফিসে যাতায়াত করতেন। বঙ্কিমের বাড়ি ছিল তৎকালীন শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের তীর্থস্থান। এ সময় তাঁর বাড়িতে বিকেল থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হতো। উল্লেখ্য, সে সময়ের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০), কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) প্রমুখ বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। নবীন হরপ্রসাদ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর স্নেহসান্নিধ্য লাভের একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ ছিল হরপ্রসাদের। কেবল নিজে নয়; অন্যেরাও বঙ্কিমচন্দ্রকে কী চোখে দেখতেন তার স্মৃতিচারণ করেছেন হরপ্রসাদঃ

> যাঁহারা সর্বদা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে থাকিতেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে কী ভাবে দেখিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। তাঁহাকে গুরু বলা যায় না, কারণ, তিনি উপদেশ দিতেন না। তাঁহাকে সখা বলিবেন, সে স্পর্ধা কেহ রাখিতেন না; অথচ সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত, ভালোবাসিত, তাঁহার মুখে একটি ভালো কথা শুনিলে কৃতার্থ হইয়া যাইত। কেহ কিছু লিখিলে যতক্ষণ বঙ্কিম না ভালো বলেন, ততক্ষণ সে লেখা লেখাই নয়। সে একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ। যে সে আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়াছে, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, অন্যের তা বুঝিবার শক্তি নাই। সাহিত্য ভিন্ন অন্য চর্চা তাঁহার বাড়িতে, অন্তত দরবারে হইতে পারিত না। আর সে চর্চার মধ্যে তিনিই সর্বময় কর্তা। যাহা তিনি বলিতেন, মানিয়া লইতে হইত, অথচ তাহাতে মান-অপমানের কিছু ছিল না। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য বি সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ৩২)

১২৮৪ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক হন। কিন্তু লেখার দায়িত্ব ছিল মূলত বঙ্কিমচন্দ্রেরই। তিনি সব সময় হরপ্রসাদকে লিখতে উৎসাহ দিতেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবেঃ

> তিনি আমাকে লিখিতে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমার এমন টান যে, প্রতি মাসেই তাঁহাকে এক-একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে জন্য কখনও প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল– হাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা– বঙ্কিমবাবুকে খুশি করিব। তিনি যদি কখনও কোনো প্রবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম। অপ্রশংসা করা বা গালি দেওয়া, কখনো তিনি করেন নাই। যেবার কিছু বলিতেন না, বুঝিতাম, লেখাটা ভালো হয় নাই। সেবার চেষ্টা করিয়া জেরা করিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতাম। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য বি সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ২৫)

১৮৭৮ খ্রি. হরপ্রসাদ লখ্‌নৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদে কাজ পান। লখ্‌নৌ যাওয়ার পূর্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে দেখা করতে যান। বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়ে ভিজে বাঁধানো সদ্য প্রকাশিত একখানি '*কৃষ্ণকান্তের উইল*' হরপ্রসাদের হাতে দিয়ে বলেন, " রেলগাড়িতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে একখানি প্রথম বাহির হইল।" এ ঘটনা হতে আমরা বুঝতে পারি, হরপ্রসাদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর স্নেহ ছিল। হরপ্রসাদই ছিলেন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত *'কৃষ্ণকান্তের উইল'*-এর প্রথম পাঠক। লখ্‌নৌতে হরপ্রসাদ এক বছর ছিলেন। তখন তিনি 'বঙ্গদর্শনে' প্রায়ই লেখা পাঠাতেন। এ সময় তাঁর লেখা সম্পর্কে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে কোনো মন্তব্য পেতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদকে কোনো চিঠিপত্র পাঠাতেন না; হরপ্রসাদও বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব বেশি পত্র পাঠাননি। এই সময় হরপ্রসাদ *বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষিত বাঙালি যুবকের মনের গড়নের উপরে কীভাবে কালিদাস, বায়রন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রভাব পড়েছে তা চমৎকারভাবে এ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লখ্‌নৌ প্রবাস থেকে পাঠানো হরপ্রসাদের এই প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এটি কোনো জর্মান পণ্ডিতের লেখা। এই প্রবন্ধে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদিত সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

> বঙ্কিমবাবুর লোক সব সমাজের লোক– শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক; শিক্ষিত যুবকের জীবন অনন্তবিবাদসংকুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। এক প্রকার বাড়িতে, এক প্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিরোধী। এইজন্য শিক্ষিত যুবকের

চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর পত্রগুলিতেও এই বিরোধীভাব কতক কতক প্রকটিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে; যেখানে আছে, সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙালি নিরীহ ভালো মানুষ। বাঙালিরা যে স্বভাব ভালোবাসে, তাহারা সকলেই সেই স্বভাবের লোক– বুদ্ধিমান, চতুর,দয়ালু, সামাজিক ও গুণগ্রাহী। তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। ঐরূপ লোকের হৃদয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপদ। তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিমবাবু ইহাদের সেইভাবেই দেখাইয়াছেন। ... বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসের ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রনের মনুষ্যানুরাগ (humanitarianism) ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুখ। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য বি সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ৪৮৭, ৪৯২)

তরুণ হরপ্রসাদের মানসলোকে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন। হরপ্রসাদ দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন – কাঞ্চনমালা ও বেনের মেয়ে। '*কাঞ্চনমালা*' নামে উপন্যাসটি হরপ্রসাদের প্রথম জীবনের লেখা। ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় '*কাঞ্চনমালা*' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। '*কাঞ্চনমালা*' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইতিহাস নির্ভর। এই উপন্যাসে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের সংঘাতের বিবরণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। এ উপন্যাসের লেখনীশৈলী ও ভাষাবিন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীশৈলীর মতো। 'বঙ্গদর্শনে' উপন্যাসটিতে লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। তখন অনেকেই '*কাঞ্চনমালা*' পাঠ করে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা মনে করেছিলেন। এর প্রধান কারণ এই উপন্যাসের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মতো সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃত অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। '*কাঞ্চনমালা*' উপন্যাসের ভাষাশৈলীর একটি নমুনা দেওয়া হলো:

.....সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা,শান্তনলিনী, কুমুদগন্ধামোদিনী, ঝিল্লীরবরূতমারুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জপুঞ্জমঞ্জুতারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয়কৃচিদুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌতবিধৌতসুরভিচর্চিত বদন শাট্যঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ়প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য মেধ্যামনঃসংযোগবৎ, পুরীতকীমনঃসংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র, প্রথম খণ্ড, অক্টোবর ২০১২: ১০৪)

পরবর্তী কালে শাস্ত্রী মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য '*কাঞ্চনমালা*'র একটি মুখবন্ধ লিখেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীশৈলী সম্পর্কে সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন:

আমাকে একবার তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমবাবুর ভাষায় "সরু মোটা খেলে।" অর্থাৎ কখনও তিনি গুরুগম্ভীর সমাস-বহুল সংস্কৃত শব্দাবলীর প্রয়োগ করেন, আবার কখনও কখনও চলতি সহজ, এমন কি, গ্রাম্য ভাষা একই পুস্তকে ব্যবহার করেন। ঁপিতৃদেবের মতে ইহাই ছিল 'সরু মোটা' লেখার লক্ষণ। 'কাঞ্চনমালা' পড়িলে মনে হয়, গ্রন্থকার ইহাতে বঙ্কিমবাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এইরূপ 'সরু মোটা' ভাষায় লেখা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাই স্থানে স্থানে কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য, সমাসবহুল ভাষা, আবার স্থানে স্থানে সহজ, ঘরোয়া এবং অতি-পরিচিত ভাষা তাঁহার একই 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে পাওয়া যায়। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র, প্রথম খণ্ড, অক্টোবর ২০১২: ৫৮৬)

বলা হয়, '*কাঞ্চনমালা*' পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত না হয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি অখুশি হয়েছিলেন। এ কারণেই মনে হয়, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার তেত্রিশ বছর পর '*কাঞ্চনমালা*' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিলম্ব প্রকাশের কারণ প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন: " কেন, কি বৃত্তান্ত – সে অনেক কথা–বলিয়া কাজ নাই।" এ সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য আছে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষণে: "আমার সহিত তাঁহার দুই-তিন বার ঘোরতর মতভেদ হইয়াছিল, এমন কি, তাহার জন্য আমাকে কিছুদিন বাংলা লেখা ছাড়িতে হইয়াছিল।" গোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য ও গণপতি সরকার 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

তরুণ বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই আধুনিক ভারতীয় ব্যক্তিত্বের মূর্তি দর্শন করতেন। পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি হরপ্রসাদের আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও তিনি আপনশৈলীতে সাহিত্যবিচার এবং নিজস্ব মতপ্রকাশে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্বকীয়তা প্রকাশে, নিজস্ব বিকাশের পথে তিনি সচেতনভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হয়েছেন।

হরপ্রসাদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিকে রচিত উপন্যাসগুলি কাব্যসৌন্দর্য ও রসসৌন্দর্যে উৎকৃষ্ট। এমন কি হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশতত্ত্ব তাঁর *'আনন্দমঠ'*(১৮৮৪), *'দেবী চৌধুরাণী'* (১৮৮৪), *'সীতারাম'* (১৮৮৭) উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন; হরপ্রসাদ তার সমর্থন করেননি, তিনি তাঁর মতামতকে ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন:

> যখন বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টিকে লোকশিক্ষার দাসী করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তাহাতে রাজি হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, চরম সৌন্দর্য, পরম সৌন্দর্য অথবা সৌন্দর্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম, তাহাই পরম ধর্ম। সুতরাং সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার করিয়া দুই জিনিসই নষ্ট করা, দুটা জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, কালিদাস কোথাও ধর্মপ্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতো হিন্দুধর্মের প্রচারকও বিরল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে Overrule করিলেন। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য বি সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ৩১)

১২৯০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় *'রঘুবংশ'* শিরোনামে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রঘুবংশ মহাকাব্যের আয়তন, কালিদাসের কোন বয়সে লেখা, এর কাব্যমূল্য ইত্যাদি বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা, কালিদাস পরিণত বয়সে এটি রচনা করেন। এ সম্পর্কে *'রঘুবংশের গাঁথুনি'* প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন:

> ... রঘুবংশ Hale's Longer English poems –এর মতো কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি, তবে একটি বংশ ধরিয়াই যখন সব কাব্যগুলি লেখা হইয়াছে, তখন উহা এক সুতায় গাঁথা আছে। ... তবে এ কাব্যগুলি সবই পাকা হাতের লেখা, ইহাদের অর্থ অতি গভীর, এবং ইহাতে উপদেশ অতি মধুর ও হিতকর। (সত্যজিৎ চৌধুরী, ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ৪১০)

রঘুবংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদের প্রতি অনেক অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, *'রঘুবংশ'* একেবারেই কাঁচা হাতের লেখা এবং কালিদাসের কম বয়সে লেখা। এ সম্পর্কে হরপ্রসাদ তাঁর *'রঘুবংশের গাঁথুনি'* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

> বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে দুইবার লিখিবার পর একদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করেন, " বঙ্গদর্শনে রঘুবংশের কথা তোমার লেখা ?" আমি বলিলাম, " আজ্ঞে হাঁ।" তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন," তুমি কি এইরূপ বরাবর লিখিবে ?" আমি বলিলাম," ইচ্ছা তো আছে।" তিনি তখন বলিলেন, "তাহা হইলে আমাকেও তোমার বিরুদ্ধে সশস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম," কেন ?" তিনি তখন গরম হইয়া বলিলেন," আমি বহুদিন অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া দেশের রুচি একটু ফিরাইয়া আনিতেছি। তুমি যে আমার সব চেষ্টা বিফল করিয়া দিবে, আমি তাহা সহিতে পারিব না। তুমি কি না বলো, রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা। কাকে পাকা বলে, কাকে কাঁচা বলে, তুমি তাহার জান কী ?" দেখিলাম, তিনি বেশ একটু রাগত হইয়াছেন। তখন আমি বলিলাম," আপনি যদি রাগ করেন, আমি না-হয় লিখিব না।" কিন্তু তাহাতেও তাঁহার রাগ পড়িল না। তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ঐ কথাই তুলিতে লাগিলেন। (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র পঞ্চম, খণ্ড, ২০০৬: ৪১০-৪১১)

এ ঘটনার পরে বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকতে হরপ্রসাদ আর রঘুবংশ নিয়ে লেখেননি। তবে হরপ্রসাদ রঘুবংশকে গভীর ভাবে পাঠ করেছিলেন, ডুব দিয়েছিলেন কালিদাসের কাব্যপাঠে। এভাবে তিনি তাঁর নিজের ধারণাকে পাকা করে তুলতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি রঘুবংশকে নিয়ে 'নারায়ণ' পত্রিকায় নয়টি প্রবন্ধ লিখেছেন– *রঘুবংশের গাঁথুনি* (শ্রাবণ, ১৩২৫), *রঘুতে নারায়ণ* (ভাদ্র, ১৩২৫), *রঘু আগে কি কুমার আগে* (আশ্বিন, ১৩২৫), *অজবিলাপ ও রতিবিলাপ* (কার্তিক, ১৩২৫), *রঘুকাব্য বড়ো কিসে* (অগ্রহায়ণ, ১৩২৫), *রঘুবংশে বাল্যলীলা* (পৌষ, ১৩২৫), *রামের ছেলেবেলা* (ফাল্গুন, ১৩২৫), *রঘুবংশে প্রেম* (চৈত্র, ১৩২৫), *রঘুবংশে প্রেম-বিরহ* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬)। 'রঘুবংশের' নির্মাণ কৌশল বা গাঁথুনিটি নির্ণয় করার অধ্যবসায়ে তিনি মূলত কালিদাসের কবিত্বশক্তির ক্রমিক উন্নততর বিকাশ, তাঁর প্রকাশশৈলীর সৌন্দর্য ও সংযম লক্ষ করে ধরে ধরে অসাধারণ আলোচনা করেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল রঘুবংশ নিয়ে লেখা সকল প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে উপস্থাপন

করবেন, তাঁর মতামত নিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে ছিলেন না। এ সম্পর্কে তিনি 'রঘুবংশের গাঁথুনি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

> বঙ্কিমবাবুর সহিত কথাবার্তার পর আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যতক্ষণ এই সূত্রটুকু (unity of purpose) খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, ততদিন আমি আর রঘুবংশ সম্বন্ধে কিছুই লিখিব না। কিন্তু যদি সেটি খুঁজিয়া পাই, বঙ্কিমবাবুকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর আবার রঘুবংশের কথা লিখিব। সে সূত্রটি ধরিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুকে দেখাইবার আর সুযোগ হইল না; দেখাইতে পারিলে তিনি কী বলিতেন, তাহাও জানিবার কোনো সুযোগ হইল না। (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ৪১২-৪১৩)

সাহিত্যের দীক্ষাগুরু, অভিভাবক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিষ্যের প্রতি প্রবল কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন এ ঘটনায় তা প্রমাণিত। আর গুরুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়েও শিষ্য হরপ্রসাদ নিজ মতপ্রকাশে ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী, আপন আলোয় সমুজ্জ্বল এক আত্মনিবেদিত মহান গবেষক।

১৮৭২ খ্রি. (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন, ৫ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ প্রবন্ধ '*উত্তরচরিত*' প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, এর অনেক বছর পূর্বে ১৮৫৭ খ্রি. বিদ্যাসাগর মহাশয় '*সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব*' গ্রন্থে ভবভূতির উত্তরচরিত নিয়ে অসাধারণ মূল্যায়ন করেছেন। বিদ্যাসাগরের মতে, ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতিচমৎকারিণী। তবে তাঁর দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা নাটকের সংলাপে অনুপযোগী।[১] উল্লেখ্য, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর '*উত্তরচরিতে*' বিদ্যাসাগরের ভবভূতিভাবনা নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন:

> ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্রুত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যেরূপ অনুরাগ, উত্তরচরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ,ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয়, অসঙ্গত বোধ হয় না।' আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্য রসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না। যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদুবাবু, মাধুবাবু তাহার কি বুঝিবেন ? (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ২২৭)

ভবভূতির মূল্যায়ন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য আমাদের কাছে বিস্ময়করই বটে। '*উত্তরচরিত*' নিয়ে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের লেখা শাস্ত্রী মহাশয় পড়েছিলেন। হরপ্রসাদ ভবভূতিকে নিয়ে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন '*বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত*' এই শিরোনামে। প্রবন্ধটি ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'নারায়ণ' পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'ভবভূতি' শিরোনামে তাঁর দ্বিতীয় লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায়। উল্লেখ্য, তখন হরপ্রসাদ বেঁচে ছিলেন না। কালিদাসের সাহিত্যপাঠের মতো ভবভূতির সাহিত্য তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে, ভবভূতি পাণ্ডিত্যের চেয়ে কবিত্বশক্তিকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। এখানে উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের '*উত্তরচরিত*' প্রবন্ধ পড়ে তিনি তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই 'তাঁর মতামতের' বিপক্ষে নিজস্ব মতামত যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র রামচন্দ্রকে কাপুরুষ বলায় হরপ্রসাদ গভীরভাবে রামচন্দ্রকে উপলব্ধি করে ভবভূতির রামচরিত্র নিয়ে এভাবে মন্তব্য করেছেন:

> বঙ্কিমবাবু বলিলেন, রাম কাপুরুষ, কিন্তু সীতা বিসর্জন মীমাংসায় উপনীত হইতে তো তাঁহার এক মিনিটও দেরি হইল না। লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি আত্মবলি দিলেন, তাহার উপর দুফোঁটা চোখের জল পড়িল বলিয়া তাঁকে কাপুরুষ বলিব ? বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, আর যে বলিতে হয় বলুক আমি তো পারিব না। আমি তো দেখি এ রাম রামায়ণ-এর রামের অপেক্ষা, প্রেমেও বড়ো, বিরহেও বড়ো, বীরত্বেও বড়ো। তবে মানুষ তো ? রক্ত মাংসের শরীর তো ? এ অবস্থায় নির্জনে বিশেষ সীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোদন ও বিলাপ কিছুতেই পরিহার করা যায় না। (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ২২২)

বঙ্কিমের '*উত্তরচরিত*' পড়ে হরপ্রসাদ বেশ সাহস করেই মন্তব্য করেছিলেন, ' সংস্কৃত উত্তরচরিত বঙ্কিমবাবুর যে ভালো করিয়া পড়া ছিল, বোধ হয় না। কালিদাসের কাছে ভবভূতি কোথায় ঋণী আছেন বঙ্কিমবাবু তা ধরতে পারেননি।'[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসাহিত্যের মূল্য বিচারের সাথে পরিণত হরপ্রসাদের সাহিত্যদৃষ্টির ছিল যথেষ্ট ব্যবধান । এই নিয়ে গুরু-শিষ্যের মধ্যে দুই-তিনবার ঘোরতর মতভেদ হয়। এমন কি শিষ্য গুরুর প্রতি অভিমান করে কিছুদিন বাংলা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর একবার অন্য একটা কারণে একটু বিবাদ হওয়ায় হরপ্রসাদ চার-পাঁচ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে যেতেন না। সময়টা ১৮৮০ সালের দিকে। তখন অনেকে হরপ্রসাদকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, এই শীঘ্রই যাব। আবার বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, হয়তো বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছে, তাই আসতে পারছে না। অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের মধ্যে মান-অভিমান থাকলেও বাইরের মানুষের সামনে তাঁরা পরস্পর ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। কেউ কোনো বিন্দু-বিসর্গ বোঝার পূর্বেই আশ্চর্যজনকভাবে তাঁদের বিবাদ মিটে গিয়েছিল। এক সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব হরপ্রসাদের কাছে পত্রসহ এক বিদেশী অধ্যাপককে পাঠিয়েছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন, ইনি যা চান, তা যেন হরপ্রসাদ করে দেন। তাঁর নাম ইভান পাভ্‌লোভিচ মিনায়েফ (১৮৪০খ্রি.-১৮৯০খ্রি.)। তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের স্বনামধন্য অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি হরপ্রসাদকে অনুরোধ করেন। তখন হরপ্রসাদের প্রথমেই যে নামটি স্মরণে এসেছিল, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তখন হরপ্রসাদের মনে হয়েছে, " তাঁহার কাছে আগে না লইয়া গিয়া অন্য জায়গায় গেলে সহচারবিরুদ্ধ হইবে।" তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে অধ্যাপক ইভানের ইচ্ছার কথা বললেন। বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদকে অনেকদিন পর নিজের বাড়িতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি অধ্যাপক ইভানকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য হরপ্রসাদের প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কেবল তাই নয়, এই উপলক্ষে সেদিন সে সময়ের কয়েকজন বিখ্যাত লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, কবি হেমচন্দ্র প্রমুখ বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এ ঘটনায় আমরা এটা বুঝতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র-হরপ্রসাদের মধ্যে কখনও সম্পর্কের টানাপোড়ন হলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গুরুর স্নেহশীলতায় আর শিষ্যের শ্রদ্ধায় বঙ্কিম-হরপ্রসাদের সম্পর্ক আত্মিক এবং সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্বল্প পরিসরে আরও স্বল্প উদ্ধৃতি সহযোগে হরপ্রসাদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু-শিষ্য সম্পর্কিত যে সমাচার আলোচিত হলো তা আকর্ষণীয় এবং অনুকরণীয়। এখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া পরিচ্ছন্ন এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এমন একটি মানদণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত যে কোনো হীনতা নীচতা তাকে আঘাত করে দীর্ণ করতে পারেনি। কোনো আবিলতা স্বচ্ছতাকে আচ্ছাদিত করতে পারেনি। সম্পর্কে মাঝে মধ্যে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে, মান-অভিমানও হয়েছে। কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক নয়। যেখানে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সমন্বয় আছে, সেখানে মান-অভিমান থাকবে। তাঁদের মধ্যে যে মতপার্থক্য পরিদৃষ্ট তা আদর্শিক এবং সাহিত্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গির। এই বৌদ্ধিক এবং বৈচারিক স্থান থেকে কেউ বিচ্যুতও হননি। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। গুরু ক্ষুণ্ন হবেন বা মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হবেন ভেবে অনেক সময় শিষ্য তাঁর ইচ্ছা কিংবা লেখা প্রকাশে বিরত থেকেছেন। এখানে মনে রাখতে হবে, গুরু বঙ্কিমচন্দ্র। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি কিছুক্ষেত্রে লোকশিক্ষা এবং সমাজশিক্ষা প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। তাই তাঁর আদর্শ প্রচারে প্রতিবন্ধকতা হতে পারে ভেবে তিনি কারও মত প্রকাশে কখনও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। হরপ্রসাদ তাঁকে ঠিকই বুঝেছিলেন। গুরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মর মূর্তি উন্মোচন করতে গিয়ে হরপ্রসাদের হৃদয়োত্থিত বক্তব্যের শেষাংশ এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য–

" তিনি জীবনে আমার Friend Philosopher and Guide ছিলেন। তিনি এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনও তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ৪৬)।

বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো এই অম্লান গুরু-শিষ্য সম্পর্ক আমাদের অনুসরণীয় হোক।

তথ্যসূত্রঃ

১. ভবভূতি একজন অতিপ্রধান কবি ছিলেন, কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নির্দেশ হওয়া উচিত। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও চমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্যান্য কবিরা অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনাবশ্যক স্থলে কোনও ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনই কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে স্থানের স্থানের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট; এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথনস্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য। (সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১৩৯৯: ১২১)

২. এই যে সীতা,– অদৃশ্য সীতা– ছায়া সীতা – ভবভূতি ইহা কোথায় পাইলেন ? বঙ্কিমবাবু ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু সে কথাটি বলেন নাই বরং বলিয়াছেন জিনিসটা একটু লম্বা হইয়াছে। ... তবে এ ছায়া-সীতা কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া বুঝিব ? এক উপায়– সেই উপায়– সংস্কৃত সাহিত্য সাগরে ডুব দাও। দেখ ভবভূতি কোথা হইতে এ ছায়া-সীতা আনিয়াছেন, এবার বেশি-দূর যাইতে হইবে না, অভিজ্ঞানশকুন্তলেই ছায়া-সীতার মূল পাওয়া যাইবে। কৌশলী কালিদাস শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে একটি অপ্সরাকে তিরস্করণী বিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে দুষ্মন্তের বিরহযন্ত্রণা দেখাইয়াছেন ও তাহার মুখে শ্রোতাদের শকুন্তলার অবস্থা জানাইয়াছেন। সে অপ্সরা বারংবার বলিয়াছে যে শকুন্তলা যদি দুষ্মন্তের এইরূপ অবস্থা দেখিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে রাজা যে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার জন্য দুঃখ করিতেন না। ভবভূতি দেখিলেন, বাঃ এত বেশ সাজানোই আছে ! আমি কেন তিরস্করণী-আচ্ছাদিত তমসার সঙ্গে সীতাকে আনাইয়া, কালিদাস যাহা করেন নাই তাহা করি; নাটক খুব জমিয়া যাইবে। বাস্তবিকও ভবভূতি তাহাই করিয়াছেন। ভাস হইতে কালিদাসের একটি সুসজ্জিত ঘটনা পাইলেন, তাহার উপর আর-একটুকু রসান দিয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর আবার সীতার হাত ধরার চেষ্টাটা তিনি ভাসের বাসবদত্তা হইতে লইয়াছেন। । (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ২২২)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত (২০১১)। স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা।
২. রমেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত ও নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত (২০০৭)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, সদেশ, কলিকাতা।
৩. সত্যজিৎ চৌধুরী (১৯৯৯)। *ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা*। সাহিত্য অকাদেমি, কলিকাতা।
৪. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত (২০১২)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

৫. সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত (২০০০)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।
৬. সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত (২০০৬)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা- সংগ্রহ,পঞ্চম খণ্ড*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।
৭. সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৩৯৯)। *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*। কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা।

৮. হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ (২০০৭)। *ছদ্মনামের অভিধান*। দীপ প্রকাশন, কলকাতা।